আবদুর রউফ চৌধুরীর ‘গল্পসম্ভার’

আবদুর রউফ চৌধুরীর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ পরিপূরক। জীবনী আলোচনায় দেখা যায় তিনি একজন আদর্শবাদী, ধর্মপ্রাণ উদারনৈতিক সমাজসেবী। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। সৃজনীসাহিত্য ও অন্যান্য রচনায় তাঁর সমাজ মনস্কতা প্রোজ্জ্বল। লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় দায়বোধ। সামাজিক অনাচার, নারীত্বের অবমাননা, ধর্মীয় গোঁড়ামি শিল্পীসত্তায় যে সদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, তারই আন্তর্প্রেরণায় আবদুর রউফ চৌধুরী কলম তুলে নেন। সমাজভূমে মোল্লাতন্ত্রের শেকড়ের অপ্রতিরোধ্য ক্রমবিস্তারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল সোচ্চার, অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সংগ্রামী লেখক।

পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্যে বসবাস কালে তাঁর সমাজ-সভ্যতা-ধর্ম এবং শৈশব-শৈশোরে মাতৃভূমিতে দেখা নিগৃহীত সাধারণ মানুষের জীবন-বাস্তবতা লেখকের মানস-গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় অব্যবস্থার কারণে লেখকের হৃদয়ের যে রক্তক্ষরণ তারই বৈচিত্রময় অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্য। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম এবং সমাজের সমবায়ে তৈরি হয়েছে আবদুর রউফ চৌধুরীর সাহিত্য-ভূগোল।

আবদুর রউফ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘গল্পসম্ভার’। এটি তাঁর গল্প সংকলন। লেখকের শিল্প কুশলতার স্ফূর্তি ঘটেছে এ গ্রন্থে। মোট ১০টি গল্প রয়েছে গ্রন্থটিতে। গল্পগুলোতে বাঙালি জীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, নারী নির্যাতন, অন্ধবিশ্বাস, সুবিধাভোগী মৌলানাদের দৌরাত্ম্য সর্বোপরি আবহমান বঙ্গপ্রকৃতির শৈল্পিক রূপায়ন ঘটেছে। বাঙালি ধর্মপ্রাণ জাতি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত ভণ্ড মৌলোভীদের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মানুষের শোষণের হাতিয়ার হিশেবে ধর্মের ব্যবহার লেখককে পীড়িত করেছে। এ কারণে লেখক বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক পর্যায়। লেখক একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার জন্যে ছিলেন সদা সচেষ্ট, ফলে এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ তাঁর একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে নারীদের উপর অত্যাচার ভারত উপমাদেশের একটি প্রাচীন প্রথা। নারীত্বের এই অবমাননা লেখককে বেদনার্তে করেছে, তাই এই গ্রন্থে ঘুরে ফিরে স্থান করে নিয়েছে নারী নির্যাতন।

‘বিকল্প’ গল্পে মাফিক ও জায়েদার বিবাহিত জীবনে মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মাফিকের শ্বশুর। অর্থগৃধ্নু শ্বশুর জামাই-এর কাছ থেকে মোহরানার অর্থ আদায় না করে কন্যাকে তার স্বামীর সঙ্গে যেতে দেবে না, তার পক্ষে ওকালতি করতে আসে ধর্মব্যবসায়ী মৌলানা, প্রয়োজনে তারা মাফিকের কাছ থেকে তালাক নিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মাফিকের তরুণ বন্ধু বাহার ও আবদ-আল-মাওলা তাদের পরিকল্পনার বিপক্ষে জোরাল অবস্থান নেয়। শেষ পর্যন্ত ভোরের আলো-ছায়ায় সকলের অগোচরে নতুন জীবনের প্রত্যাশায় মাফিক ও জায়েদা যাত্রা করে। গল্পটির সমাপ্তি গভীর ইঙ্গিতবহ। কুসংস্কারে আবদ্ধ জীবন থেকে উদারনৈতিক জীবনের উদ্বোধনের ইঙ্গিত প্রদান এবং পুরাতন ও নতুন জীবনের সংঘাত ও নতুনের বিজয়কে অর্থবহভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

‘বন্ধুপত্নী’ মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। নারী হৃদয়ের যাতনা ও পুরুষ মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে গল্পটি মূল্যবান।

‘শাদী’ গল্পে পুরুষের জন্যে একাধিক বিয়ে কখন এবং কেন জায়েজ এবং বিয়ের আগে বর-কনে পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপকারিতা ইত্যাদি বিয়ে বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বোবা-কনের বিয়ের প্রসঙ্গ সংযোজিত হওয়ায় গল্পটি ঋদ্ধ হয়েছে।

এক সাহসী গ্রাম্য তরুণী তান্বীর অসীম সাহসিকতার আলেখ্য ‘বীরাঙ্গনা’ গল্প। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে পাক-হানাদার-বাহিনী ও রাজাকারদের পৈশাচিকতার বিপরীতে উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গ-ললনার বীরাঙ্গনা রূপ। গ্রাম্য-বধূ তান্বী যখন পশ্চিমা পিশাচদের হাতে নিহত স্বামীর শব জড়িয়ে আলুথালুবেশে বিলাপ করছে তখন পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদেও নেতা জাবেদেও লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তান্বীর উপর। কামলোলুপ জাবেদ তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে তান্বী তার গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয়। বঙ্গ-ললনার হঠাৎ এই মূর্তিতে হতচকিত জাবেদ ফিরে যায় তার সৈন্যসামন্তসহ। গল্পের বিষয়বস্তু আসলে প্রতীকী। এর মধ্য-দিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা এবং আপামর বাঙালির প্রতিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ‘ট্যাক্‌রা-ট্যুক্‌রি’ গল্প। এই গল্পে লেখকের মনস্বিতার পরিচয় সুস্পষ্ট। নারী নির্যাতন, নারী অধিকার, ধর্মেও নামে নারীকে দাবিয়ে রাখা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের

সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে মৌলভীদেও দৌরাত্ম্যে কীভাবে শিশু ও নারী নির্যাতিত হচ্ছে তা লেখক তুলে ধরেছেন।

‘ভূত ছাড়ানো’ গল্পে লেখক বাঙালি জীবনে বহুদিন থেকে চলে আসা একটি বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করেছেন। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস বাঙালির আবহমান কাল থেকে। মদরিছের স্ত্রীর ভূত ছাড়াতে আসা অর্থলোভী কামুক পীর এবং সে ভূত ছাড়িয়ে অর্থ নিয়ে যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত জানা যায় আসলে মদরিছ তার স্ত্রীকে ‘নাইওর’ যেতে দেয়নি তাই সে ভান করেছিল। এই গল্পের মধ্য-দিয়ে গ্রাম্য কুসংস্কারের কারণে সরলপ্রাণ মানুষগুলো কীভাবে প্রতারিত হচ্ছে তারই বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার।

‘বাহাদুর বাঙালি’ গল্পে তীব্র ঘৃণা নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজাকারদের প্রতি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের ভূমিকা এবং এখন তাদের অবস্থান ও ক্রিয়াকর্মের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই গল্পে। সময়ের ব্যবধানে যে তাদের অবস্থান ও বিশ্বাসের সামান্যও ব্যত্যয় ঘটেনি তারই যথার্থ আলেখ্য লেখক উপস্থাপন করেছেন।

যৌতুকপ্রথাকে উপজীব্য করে গল্পকার লিখেছেন ‘যৌতুক’ গল্প। মাওলানা মোহম্মদ আবদুস সবুর আখন্দ তার পুত্রের বিয়েতে রঙিন টিভি যৌতুক দাবি করেন। কোনও ভাবেই তিনি যৌতুক ছাড়া বিয়ে করাবেন না। ফলে বিরোধ বাঁধে কলেজ পড়ুয়া, জিনস্-পরা তার ছেলে জাফর ইকবালের সঙ্গে। পিতা ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যৌতুক গ্রহণকে জায়েজ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, অন্যদিকে পুত্র আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্ম ও সামাজিক অবস্থার যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে পিতার যুক্তির অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করে। যখন মাওলানা সাহেবের ভাগ্নি শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের জন্যে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে তখন তার বোধদয় হয় এবং যৌতুক ছাড়াই পুত্রের বিয়েতে তিনি সম্মত হন। গল্পকার আবদুর রউফ চৌধুরী তাঁর লেখনী সর্বদাই কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ গল্পেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সে সঙ্গে নিজে কষ্টে না পড়লে যে অন্যের কষ্ট অনুভব করা যায় না তার প্রমাণ করেছেন।

পিতৃপরিচয়ের অভাবে সফিকের আত্মদাহন, মায়ের উপর বর্তমান পিতার পৈশাচিক অত্যাচার এবং পিতৃপরিচয় পাওয়ার পর তার গভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে লেখা ‘পরিচয়’। প্রসঙ্গক্রমে মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বর্বরতা, নারী ধর্ষণ এবং ধর্ষণে তাদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করা সন্তানদের প্রসঙ্গ সংযোজিত হওয়ায় গল্পটি ঋদ্ধ হয়েছে।

নীলার পারিবারিক জীবনের সঙ্কট অবলম্বন করে নারী ও পুরুষের অবাধ মিলনে সৃষ্ট সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ‘জিনা’ গল্পে। মূল-কাহিনীর তুলনায় তাত্ত্বিক কথাবার্তাই এ গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে।

সামাজিক অত্যাচার-অনাচার, কুসংস্কার এবং মৌলবাদের অপ্রতিরোধ্য প্রসারমানতা এবং মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলনে আবদুর রউফ চৌধুরী ছিলেন একনিষ্ঠ। তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে এই বিষয়গুলো ছায়া ফেলেছে।

আবদুর রউফ চৌধুরী প্রত্যাশা ও বিশ্বাস করতেন বাংলাদেশে একদিন প্রগতিশীল, স্বাধীনতার চেতনা-সঞ্চারী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হবে। শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হবে। শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কুসংস্কার থেকে মানুষ মুক্ত হবে। ‘গল্পসম্ভার‘-এ সেই প্রত্যয়ই যেন ব্যক্ত হয়েছে। মুক্তির পরম্পরার মাধ্যমে তিনি সত্য, ন্যায় ও তাঁর অভীপ্সিত বাংলাদেশের কথা ব্যক্ত করেছেন।

আবদুর রউফ চৌধুরী প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমী লেখক ছিলেন। কখনই অসত্যের সঙ্গে আপোস করেননি। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে ও নিজের দেখে যা দেখেছেন এবং সত্য বলে জেনেছেন তাই নিরাভরণভাবে দেশজ প্রতীক, উপমা, রূপকের মাধ্যমে এবং অনেকটা ‘বঙ্কিমী’ ভাষাদর্শে উপস্থাপন করেছেন। একজন জীবনবাদী লেখক হিশেবে এবং প্রচলিত অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সাহিত্যিক হিশেবে বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য।

অনিরুদ্ধ কাহালি

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়